অভিসরণ / ABHISARON
A Multilingual International Peer-Reviewed Research Journal
Volume 1, Issue II, July 2026, PP. 203-211
www.abhisaron.com
ISSN-3139-4027(Online)
DOI - https://dx.doi.org/10.67757/abhisaron.2026.v1i2.029

NATYAKAR MANOJ MITRER MANCHABHABNA O MANCHANIRDESHANA / নাট্যকার মনোজ মিত্রের মঞ্চভাবনা ও মঞ্চনির্দেশনা

DR. RAFIKUL ISLAM/ড. রফিকুল ইসলাম
সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মুর্শিদাবাদ মহারাজা কৃষ্ণনাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বহরমপুর
Email: rafikulislamknc17@gmail.com

Accepted: 07.07.2026
Published: 20.07.2026

Keywords:
নাটকের প্রাণ প্রতিষ্ঠা, নাট্যকারের অভিপ্রায়, রবীন্দ্র ভাবনা, পরিস্থিতির বর্ণনা, উপন্যাসোপম বর্ণনা, সুর ও আলো, কাব্যিকতা, সংক্ষিপ্ত নির্দেশনা

Abstract:

সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো নাটক শুধুমাত্র লেখক ও পাঠকের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। নাটককে শেষ পর্যন্ত অভিনীত হতে হয়। এই সূত্রে নাটক রচয়িতা ও পাঠকের মাঝখানে এসে যায় নাট্য পরিচালক বা নির্দেশক, অভিনেতা-অভিনেত্রী, শব্দ ও আলোক শিল্পী এবং আরও অনেকে। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে নাটকটি যখন মঞ্চস্থ হয়, তখনই সেটা সম্পূর্ণতা লাভ করে। অভিনয়ের সময় অভিনেতাদের প্রবেশ-প্রস্থানের মতো সাধারণ কিছু নির্দেশনা সব নাটকেই থাকে। তার পরেও কোনো কোনো নাট্যকার বিস্তৃত নির্দেশনার দিতে পছন্দ করেন। আসলে একজনের বিশেষ ভাবনার ফসল একটি নাটক যখন পরিচালক বা নির্দেশকের মতো অন্যজনের হাতে চলে যায় তখন সেটি যাতে মূল ভাবনা থেকে খুব সরে না যায় তার জন্য নাট্যকার তার রচনার মধ্যে দিয়ে রাখেন দীর্ঘ মঞ্চনির্দেশনা। তাতে চরিত্রদের মনোলোক এবং নাট্যকারের অভিপ্রায়কে ধরবার চেষ্টা থাকে। পাশাপাশি মঞ্চসজ্জার পরামর্শ দিয়ে পরিচালকের কাজ সহজ করতে চান। রবীন্দ্রনাথ এই ধরণের নির্দেশনার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু পরর্বতীকালের নাট্যকারেরা পাশ্চাত্যের নাট্যকারদের অনুসরণে মঞ্চসজ্জা ও মঞ্চনির্দেশনার মতো বিষয়টিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে লিপিবদ্ধ করেছেন। মনোজ মিত্র নিজে রচনার পাশাপাশি পরিচালনাতেও নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছিলেন বলে নির্দেশনার প্রয়োজনীয়তা, সুবিধা-অসুবিধা জানতেন। তাই অধিকাংশ নাটকে তিনি ঐ পথে হেঁটেছেন।

তাঁর 'চাকভাঙা মধু, 'সাজানো বাগান', 'নাকছাবিটা' 'পরবাস', 'পালিয়ে বেড়ায়' প্রভৃতি নাটকে অনেক সময় ঔপন্যাসিকের মতো পরিবেশ-পরিস্থিতি এমনকি চরিত্রের মনোলোকে আলো ফেলতে চেয়েছেন। 'তেঁতুলগাছ' নাটকে মঞ্চের সামান্য উপকরণের সাহায্যে যেভাবে দর্শকদের কাছে রেলযাত্রা, বাসযাত্রাকে আভাসিত করেছেন, তাতে বিস্মিত হতে হয়। কিছু নাটকে অবশ্য তিনি মিতবাক।

Discussion:

নাটক মিশ্র শিল্প। সাহিত্যের আন্যান্য শাখা যথা কবিতা, গল্প, উপন্যাস যেমন রচয়িতা ও পাঠকের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কে সীমাবদ্ধ, নাটক তা নয়। অন্যান্য শিল্পের মতো নাটকও শুধুমাত্র পাঠের মধ্য দিয়ে পাঠক মনকে আনন্দ-আস্বাদ দিতে সক্ষম। কিন্তু তার সার্থকতা বিশেষভাবে মঞ্চসাফল্যের ওপরেই নির্ভর করে। যতক্ষণ একটি নাটক তার লিখিত বা মুদ্রিত রূপের মধ্যে আটকে থাকে ততক্ষণ সেটি প্রাণহীন--এমন কথাও বলেন কেউ কেউ। আমরা যদিও ওই কথার সঙ্গে সম্পূর্ণ সহমত নই, তবু স্বীকার করতে হয় যে নানা কলাকৌশলের সাহায্যে সেই 'প্রাণহীন' নাটকে প্রাণপ্রতিষ্ঠাই শেষ কথা। মোটকথা দর্শকদের জন্য নাটকের অভিনয়ের ব্যবস্থা করতে হয়। আর এই অভিনয়ের সূত্র ধরে নাটকের রচনাকার ও দর্শকের মাঝখানে অনিবার্যভাবে এসে যান নাট্যপরিচালক তথা প্রযোজক, অভিনেতা, মঞ্চ-আলো-সঙ্গীতের দায়িত্ব প্রাপ্ত শিল্পীগণ। একজন গল্পকার বা ঔপন্যাসিক যেমন লেখার শেষ বাক্য পর্যন্ত তাঁর পাঠকের সঙ্গে হাঁটার সুযোগ পান, নাটক রচয়িতার সেই সুযোগ থাকে না। নাট্যকাহিনিকে রূপ দিতে নিজের হাতে গড়ে তোলা কতকগুলি চরিত্র ও তাদের মুখে বসানো সংলাপগুলিই যদিও তাঁর প্রধান সহায়, তবু কেবল সেগুলিই তাঁর অভিপ্রায়কে ফুটিয়ে তুলতে যথেষ্ট নয়। বিশেষত তিনি যখন সরে যান নেপথ্যে, তখন চরিত্রের পারস্পরিক এবং একই সঙ্গে দর্শকদের সঙ্গে সংযোগের উপায়টি কী হবে সেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। সুন্দর একটা মঞ্চপরিপ্রেক্ষিত নাটকের সাফল্যের জন্য অপরিহার্য। অপরিহার্য এই জন্য যে, একটা নাটক শুধু নাট্যঘটনার সমাহার নয়, তাকে নাট্যকারের বিষয় ভাবনা প্রকাশের পাশাপাশি পালন করতে হয় শৈল্পিক দায়বদ্ধতাও। এই প্রয়োজনে নাটকে বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে এসে যায় মঞ্চসজ্জা ও মঞ্চনির্দেশনা।

মঞ্চ নির্দেশনা দু'রকমের দায়িত্ব পালন করতে পারে। সাধারণ মঞ্চনির্দেশনায় মঞ্চের ওপর উপস্থিত নাটকের চরিত্রদের বাহ্যিক আচরণ ও ক্রিয়ার নির্দেশ বহন করে। এই রকম নির্দেশনা কখনো হয়েছে হ্রস্ব, কখনও বা দীর্ঘ। এ সবের পাশাপাশি চরিত্রদের মনের কিছুটা হদিশ দিতেও সহায়ক হয় মঞ্চনির্দেশনা। মঞ্চপ্রেক্ষিতকে বিশ্বাস্য ও সংযোগশালী করে তুলতেই দীর্ঘ মঞ্চসজ্জা ও নির্দেশনার অবতারণা ঘটে থাকে। মঞ্চে নাট্যঘটনার উপস্থাপনার ক্ষেত্রে যদিও পরিচালক ও অভিনেতার দায়িত্ব থাকে সবচেয়ে বেশি, তবু নাটককার নিজ সৃষ্টিকে সর্বার্থে সুন্দর করতে সেই দায়িত্ব নিতে চান। তাছাড়া প্রয়োগকৌশলের নতুন নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রণোদনাতেও নাটক রচয়িতা মঞ্চসজ্জা ও মঞ্চনির্দেশনা নিয়ে ভাবিত হন। মঞ্চনির্দেশনা সে জন্যই প্রথাগত রূপ ছেড়ে বারে বারে নতুনত্বের সন্ধান করে। একালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও জনপ্রিয়তম নাট্যকার মনোজের নাটকের মঞ্চনির্দেশনাতে সেই অভিপ্রায়ই ফুটে। রবীন্দ্রনাথ এক সময় রঙ্গমঞ্চে দৃশ্যপটের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দিতে চাননি। দৃশ্যকাব্যের কবির কবিত্বশক্তি ও দর্শকদের কল্পনাশক্তির প্রতি গভীর আস্থা রেখে তিনি তাকে অপ্রয়োজনীয় মনে করেছিলেন। বলেছিলেন-

"ভাবুকের চিত্তের মধ্যে রঙ্গমঞ্চ আছে, সে রঙ্গমঞ্চে স্থানাভাব নাই। সেখানে জাদুকরের হাতে দৃশপট আপনি

রচিত হইতে থাকে। সেই মঞ্চ, সেই পটই নাট্যকারের লক্ষ্যস্থল, কোনো কৃত্রিম মঞ্চ ও কৃত্রিম পট কবিকল্পনার উপযুক্ত হইতে পারে না।" [১]

তিনি দীর্ঘ নাট্যনির্দেশনা না রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। এক্ষেত্রে তাঁর যুক্তি ছিল নাটকে নাট্যকারের পরামর্শ, উত্তরকালের নাট্য নির্দেশকের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে। কিন্তু আধুনিক পাশ্চাত্য নাট্যকারেরা ছিলেন বিপরীতপন্থী। তাঁদের বক্তব্য যেহেতু নাটক সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি শিল্পমাধ্যম এবং নাট্যকারের বক্তব্যের বাহন, অথচ মঞ্চে সেই নাট্যকারই থাকেন অনুপস্থিত, তাই মঞ্চের সজ্জা, অভিনেতা বা চরিত্রের বেশবাস ও অবস্থান সম্পর্কে বিস্তৃত পরামর্শ তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুটনে সহায়ক হয়। ইবসেন, জর্জ বর্ণার্ড শ বা গলসওয়ার্দির নাটকে দেখা যায় দীর্ঘ নাট্য-পরামর্শ। রবীন্দ্রোত্তর নাট্যকারদের মধ্যে বিজন ভট্টাচার্য এই নতুন পথে হেঁটেছেন। নাট্য মুক্তির পথে রবীন্দ্রনাথই তাঁদের পথ-প্রদর্শক হলেও এক্ষেত্রে মনোজ মিত্র রবীন্দ্রানুসারী নন। বরং তিনি পাশচাত্যের বার্ণাড শ বা গলসওয়ার্দির মতন প্রয়োজনে নাটকে তাঁর পরামর্শ দীর্ঘ করেছেন। বিজন ভট্টাচার্য বা উৎপল দত্ত এ ক্ষেত্রে তাঁর স্বগোত্রীয়। নিজের নাটকের মঞ্চ নির্দেশনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে এক সাক্ষাৎকারে মনোজ জানিয়েছেন -

"আমি একটু জায়গা, সময়, দিন, রাত্রি, কখন কি রকম অবস্থা ইত্যাদি ভিসুয়ালগুলি লিখে থাকি, এরকম লিখতে ভালো লাগে। অ্যাক্যুয়াল লাইফ থেকে আমি লিখতে চাই। পেরে উঠি কি না জানি না। মঞ্চের পর্দা উঠল, মঞ্চে ডানদিকে-বাঁদিকে এটা এরকম আছে, ওটা ওরকম আছে--এ আমি কোনওদিন লিখব না। আমার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগই আছে--আমার নাটকে পরিস্থিতির বর্ণনা একটু বেশিই থাকে। সাম্প্রতিককালে লেখা 'নাকছাবিটা'-তে অজস্র বর্ণনা আছে। তাতে তো আমার পরিচালক বন্ধুরা বলেন, তাদের সুবিধাই হয়। অ্যাকচ্যুয়ালি ইনটেনশন অব দ্য প্লে রাইট খোঁজা যায়। হুবহু সেটা করতে হবে তা নয়, তবে সে কি চাইছে তা ধরা পড়ে।"[২]

মনোজের নাটকের মঞ্চ এবং দৃশ্যভাবনার কৌশল ও নাট্য নির্দেশনার উপন্যাসোপম বর্ণনা আমাদের চমকে দেয়। দৃশ্যে দৃশ্যে মনোজের নাট্য নির্দেশনা ও পরামর্শগুলি এই সূত্রে স্মরণীয়। মনোজের এই দীর্ঘ নির্দেশনার দৃষ্টান্ত আমরা গ্রহণ করতে পরি তাঁর প্রথম পর্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠরচনা চাকভাঙা মধু থেকে-

[বিকেলের হলদে কোমল রোদ্দুর মাতলা ওঝার জীর্ণ কুঁড়ে ঘরের চালে চিক চিক করছে। উঠোনে ছড়িয়ে আছে লম্বা লম্বা গাছের ছায়া, অল্প অল্প। দাওয়ায় শরীর এলিয়ে ঘুমুচ্ছে বাদামী। তার ক্লান্ত কালি পড়া চোখে মুখে কী অসম্ভব হলদে নিষ্প্রাণতা! দূরে কোথাও একটা কাঠঠোকরা গাছের গায়ে একটানা ঠোঁট ঠুকছে। জংলা পাখি, ঘুঘু জাতীয়, মাঝে মাঝে ডাকছে। দাওয়ায় একটা দড়ির দোলনা টাঙানো, তার মধ্যে একটা ছেঁড়া মাদুরের টুকরো বসানো। দোলনাটা মৃদু মৃদু দুলছে, ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ উঠছে। অদূরের আলপথের ঢালু পাড় বেয়ে একটা লোক নেমে আসছে উঠোনের দিকে। মাতলা বাড়ি ঢুকছে।...][৩]

এতটা দীর্ঘ বর্ণনা পাঠ করেন না নাটকের দর্শকেরা। এর মধ্যে একটিও সংলাপ না শুনিয়ে দর্শককে নাটকে ডুবিয়ে রাখেন মনোজ। এইখানেই এই নতুন রীতির নাট্য নির্দেশনার সার্থকতা।

নাট্য প্রযোজক তথা পরিচালকের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে নাট্য বিশারদ ড. সাধন কুমার ভট্টাচার্য বলেন-

"... নাট্য-প্রযোজকের দক্ষতা নাটকান্তার্গত চরিত্রগুলিকে স্থানিক, কালিক, পরিবেশসহ পরিস্ফুট তথা জীবন্ত করে দর্শকদের সম্মুখে উপস্থাপিত করার মধ্যেই নিহিত। আরো নির্দিষ্টভাবে বলা যায়—প্রযোজক দৃশ্য, রূপারোপ, আলোক, শব্দ, অভিনেতা প্রভৃতি উপাদানকে প্রয়োগ করবেন—নাট্যকারের প্রতিভাকে (intuition) বা জীবনের ধ্যানকে বাস্তবায়িত করবার জন্যেই..."[৪]

.

মনোজ মিত্র প্রযোজক বা পরিচালকের এই দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলে নাটক রচনার সময় তিনি নাট্যদৃশ্যের স্থান কাল পাত্র এমনকি চরিত্রের মনোলোকের পরিচয়ও দিয়ে রাখেন একটু বড়ো করেই। তাঁর 'নাকছাবিটা' নাটক থেকে দৃষ্টান্ত-

"[কাছেই সমুদ্র...
পাঁচিলের দরজা ঠেলে জানকী উঠোনে পা রাখতে, নির্জন নিস্তব্ধ বাংলো বাড়ি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল তরঙ্গের একটানা গুঞ্জনে।
বাড়িটা পুরনো, একতলা। তেমন ভাবে সাফসুফ হয়না। ঘোমটার মতো আগাছা ঝুলছে সিঁড়ির মাথার নিচু ছাউনিতে। ঘরের দরজায় তালা। উঠোনের কোণে ইঁদারা। মুখ ঢাকা টিনটা হেলে পড়েছে।
রৌদ্দুর নেই। আলো আছে-- মরা বিকেল। শ্রান্ত জানকী চারদিকে চেয়ে চেয়ে দেখল। হাতের পেট মোটা ব্যাগ দুটো নামিয়ে বারান্দায় ওঠার সিঁড়িতে বসে, কারও অপেক্ষায়।]"[৫]

দীর্ঘ মঞ্চ নির্দেশনা পাওয়া যায় 'শিবের অসাধ্যি' নাটকেও। মঞ্চ পরিপ্রেক্ষিত তাঁর মনোমত করে গড়ে তুলতে নাট্যকার এই দীর্ঘ নির্দেশনা রেখেছেন। তাতে মঞ্চসজ্জা কেমন হবে, আলোর ব্যবহার করা হবে কীভাবে, কোন ধরনের বাদ্য-বাজনা কেমনভাবে বাজবে, শব্দ কীভাবে চড়া থেকে ক্রমশ কমতে থাকবে-সব কিছুই ধরিয়ে দিতে চেয়েছেন নাট্যকার। তাঁর নির্দেশনায় -

"[পর্দা ওঠার আগে ঢাক ঢোল কঁসির বাজনাটা বেশ জোরে জোরেই চলছিল। পর্দা সরে যেতে বাজনাটাও দূরে সরে গেল। বহুদূরে টিমটিম করে বাজতে লাগল। মঞ্চের পশ্চাৎপটে ফাঁক ফাঁক করে দাঁড় করানো পর পর পাঁচটি দৃশ্যপট। মাপ সমান নয়, মাঝেরটি সবচেয়ে বড়, দু'পাশে দুটি মাঝারি, প্রান্তের দুটি সকলের ছোট। অর্থাৎ মাজের উঁচু থেকে ক্রমশ দু'পাশে মাথাগুলি নিচু হয়েছে। অবিকল দুর্গাপ্রতিমার চালচিত্রের মতো দেখাচ্ছে।]"[৬]
বোঝা যায় নাট্যকার মনোজ শুধু তাঁর বিষয়-ভাবনা প্রকাশেই নিজেকে আটকে রাখেন না, কেমনভাবে তা প্রকাশ করা যাবে তা নিয়েও তিনি সমান ভাবিত। যে নাটকের নাম 'শিবের অসাধ্যি' এবং চরিত্র হিসাবে স্বয়ং শিব দুর্গা গণেশ কার্তিক হাজির, সে নাটকের আবহ তৈরির জন্য নাট্যকার দৃশ্যপটকেও ব্যবহার করতে চান যথাযথ আবহ তৈরির জন্য। দুর্গাপ্রতিমার চালচিত্রের মতো দৃশ্যপট সেই আবহ তৈরি করে দেয়। এই নির্দেশনায় থামেন না নাট্যকার। নেশাগ্রস্ত শিবঠাকুরের আবির্ভাব-দৃশ্যকে ফুটিয়ে তুলতে তাঁর আরও নির্দেশনা-

"[সারা মঞ্চে ধোঁয়ার কুণ্ডলি ভাসছে। মাঝের খোপ তিনটিতে হাল্কা নীল আলো ফুটে রয়েছে। সবচেয়ে বড়টির মধ্যে দেবাদিদেব শিবঠাকুরের মূর্তি শোভা পাচ্ছে। মাথায় জটাজুট, পরনে বাঘছাল, ভস্মমাখা শিবঠাকুর কানে ধুতুরাফুলের দুল ঝুলিয়ে মস্তবড় কঙ্কেকেতে পেল্লায় টান বসাচ্ছে। টানের পরে নেপথ্যে সমবেত গম্ভীর নাদ উঠছে: বো-ও-ওম! খানিক পরে রাশিকৃত ধোয়া যখন শিবের ফুলকো গালের গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসছে, নেপথ্যে সমবেত ধুনি উঠছে: ফু-উ-উ-স! শিব নেশায় চুর, দু চোখ বন্ধ। কিছু পরে শিবঠাকুরের দুই পাশের ঘুলঘুলিতে নন্দী ও ভঙ্গী উদয় হল। ভৃঙ্গীর কাঁধে পোটলা-পুটলি। দুজনেরই সাজ বাহারী। ভঙ্গী হাবাগোবা, তার মাথাটি কামানো। নন্দী চালাকচতুর, চুল জুলপি পোশাক সব হালফিলের, হিপির মতো।]"[৭]
নেশাখোর শিবঠাকুরের একটা লৌকিক মূর্তি জনমানসে বিদ্যমান। মনোজ তাঁকে ভাঙেননি, বরং তাকে কতখানি মজাদার করা যায়, সে চেষ্টাই করেছেন। তার জন্যই এই দীর্ঘ নির্দেশনা। নাটকের কমিক্যাল আবহটি এখানেই তৈরি হয়ে যায়। শিবঠাকুরের দু'ই চ্যালা নন্দী ভৃঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য দেখিয়ে দিয়ে থামেননি, সেই সঙ্গে দুজনের মানসিক গঠনটাও বুঝিয়ে দিয়েছেন শুরুতে। হালফিলের হিপির মতো চুল জুলপি-আলা নন্দীকে হাজির করে কৌতুককর আবহকে জমাট করেছেন নাট্যকার। এই দীর্ঘ মঞ্চনির্দেশনা দিয়ে নাট্যপরিচালকের কাজ অনেকটাই কমিয়ে

দিয়েছেন যেমন, তেমনি তাঁর মানস নেত্রে তিনি সেটিকে কেমনভাবে দেখছেন, তা স্পষ্ট করে দেন। নাট্য গবেষক অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায় নাট্যাভিনয়ের ক্ষেত্রে নাট্য চরিত্রের স্বরূপ ও রহস্য এবং নাট্যকারের অভিপ্রায়কে গুরুত্ব দান করেন। বলেন -

"অভিনেতা বা অভিনেত্রী নাট্যসংলাপের অর্থ ও ব্যঞ্জনা আবৃত্তি বা উচ্চারণ-কৌশলে যদি প্রকাশ করতে না পারেন, তাহলে নাটকের সমূহ ক্ষতি। প্রথমত, নাট্য চরিত্রের স্বরূপ ও তার অন্তরের রহস্য দর্শকের সামনে অপ্রকাশিত থেকে যায়। দ্বিতীয়ত, নাট্যকারের অভিপ্রায় ব্যর্থ হয়ে যায়, বক্তব্যও বিকৃতরূপ লাভ করে।"[৮]

নাট্যকার মনোজ মিত্র এ বিষয়ে সচেতন থেকেই তাঁর 'পরবাস' নাটকে শুরুতে রেখেছেন প্রস্তাবনা এবং সেখানে নাটকের নায়ক গজমাধবের প্রেম ও ব্যর্থতার আভাস দিতে চেয়েছেন। বর্তমানের বৃদ্ধ গজমাধবের মনের একাকীত্বকে ফোটাতে তার সেই ইতিহাস জরুরী। নাট্যকার অদ্ভুত কৌশলে সেই কাজটি সেরেছেন। তার প্রত্যাশায় প্রেমিকার প্রায় দশ-বার বছরের অপেক্ষাকে মাত্র দেড় পৃষ্ঠার প্রস্তাবনা অংশে আভাসিত করতে মঞ্চনির্দেশনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে-

"[সানাই বাজছে। পর্দা খুলে গেল। আবছা নীল আলো অন্ধকারে মঞ্চখানি মায়াময়। যেন এক স্বপ্নের জগৎ, যেন বহুদূর অতীতের বিস্মৃত পৃষ্ঠাখানি উন্মোচিত হয়ে রয়েছে। বিয়ের কনের সাজে সজ্জিত একটি মেয়ে (মন্দিরা) হাতে পত্রগুচ্ছ নিয়ে পায়ে পায়ে ঢুকল এবং এক কোণে আলোর বৃত্তের মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল। সানাই থামলে প্রেমিকা-রূপী মন্দিরা তার প্রবাসী প্রেমিকের উদ্দেশে পত্রপাঠের ঢঙে বলতে লাগল।]"[৯]

সানাইয়ের সুর আর নীল আলোয় মঞ্চের ওপর এক মায়াময় স্বপ্নের জগৎ গড়ে তোলার পরামর্শ দিয়ে রেখেছেন নাট্যকার। নির্দেশ দিয়েছেন একই মঞ্চের ওপর কীভাবে কলকাতা ও কাঁকড়াপোতায় অবস্থিত প্রেমিক প্রেমিকা তাদের পত্রের বয়ান তুলে ধরবে। দুপাশের দু'ই আলোকবৃত্ত তাদের মধ্যেকার স্থানিক দূরত্বকে নির্দেশ করবে। লক্ষ্যনীয়, এখানে মানাজের মঞ্চনির্দেশনার ভাষায় স্পষ্টতই কাব্যের সুর 'যেন এক স্বপ্নের জগৎ, যেন বহুদূর অতীতের বিস্মৃত পৃষ্ঠাখানি উন্মোচিত হয়ে রয়েছে'। কাব্যিকতা মনোজের সংলাপে ছায়া ফেলেছে-এ কথা সর্বজনবিদিত। এখানে মঞ্চ নির্দেশনাতেও তার স্পর্শ। পরিবেশ-পরিস্থিতির দীর্ঘ বর্ণনা রেখেছেন নাট্যকার তাঁর সর্বাধিক আলোচিত নাটক 'সাজানো বাগান' নাটকে। এ নাটকের সংলাপে কাব্যিকতা থাকলেও নির্দেশনা প্রায় নিরাভরণ। নাটকের মুখ্য চরিত্র বাঞ্ছারাম পঁচানব্বই বছরের বুড়ো। তার বিপরীতে জমিদার ছকড়ি দত্তের প্রেতাত্মা। বেশিরভাগ ঘটনা ঘটেছে বাঞ্ছার সবুজ গাছপালায় ঘেরা বাড়িতে। এগুলোকে বিশ্বাসযোগ্য করে তুলতে মনোজ মিত্র যতটা সম্ভব প্রয়াস চালিয়েছেন। প্রথম দৃশ্যের শুরুতেই এরকম নির্দেশনা-

"[বাঞ্ছারামের বাড়ি। পিঠের দিকে একটা ফলের বাগান নিয়ে বৃদ্ধ চাষী বাঞ্ছারাম কাপালির মাটির চালা ও উঠোন মঞ্চের অনেকটা জুড়ে রয়েছে। নেপথ্যের বাগানের দু-একটা সবুজ পাতাভরা ডাল উপুড় হয়ে পড়েছে বাঞ্ছারামের ঘরের চালে। বাগানের রাস্তার মুখে একটা কাকতাড়ু। সন্ধ্যের একটু আগে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে আলোছায়া অলৌকিক নকশা কেটেছে বাঞ্ছারামের উঠোনে। ঘরের দাইয়ায় ছেঁড়া মাদুরের ওপর কাঁথাঢাকা একটা স্তূপ দেখা যাচ্ছে। মঞ্চ ফাঁকা। বাগান থেকে একটা ভৌতিক কান্না ভেসে আসছে। একটু পরে পরলোকগত জমিদার ছঁকড়ি দত্তের প্রেতাত্মা কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এলো বাগানের পথে। তার কোমর ভেঙে গেছে।]"[১০]

শৈশবে দেখা গাঁওবুড়ো বাঞ্ছা কাপালির সঙ্গে যৌবনে পড়া হিন্দি লোকগল্পের বুড়োর কহানির মিলন-মিশ্রণে তাঁর মনের কারখানা ঘরে গড়ে উঠেছিল বাঞ্ছার যে আদল, তাকে যথাযথভাবে তুলে ধরতেই নাট্যকার এমন বর্ণনা দিয়ে রেখেছেন।

'পালিয়ে বেড়ায়' নাটকের প্রথম দৃশ্য পরিকল্পিত হয়েছে ট্রেনের কম্পার্টমেন্টে। মঞ্চে ট্রেনের যাত্রাকে আভাসিত করতে চেয়েছেন ট্রেনের বাঁশি, যাত্রীদের দুলুনির সাহায্যে। কিন্তু শুরুতেই যাত্রী রূপচাঁদের মানস যাত্রাকে ধরিয়ে দিয়েছেন নাট্যকার তাঁর নির্দেশনার সাহায্যে-

"[রাতের রেলগাড়ি। কামরার অংশমাত্র দৃশ্যমান। যাত্রী একা রূপচাঁদবাবু। আড়ময়লা ধুতি পাঞ্জাবির ওপর সুতির জহরকোট, গলায় কম্ফর্টার--সেই সঙ্গে কাঁচাপাকা বাবরি আর লতানো গোঁপের কোলে খুশির হাসিটি নিয়ে রূপচাঁদ খোলা জানালায় বসন্তের হাওয়া খাচ্ছে। গাড়ি ছুটছে। দূর থেকে ডাক ভেসে আসছে রূপচাঁদবাবু রূপচাঁদবাবু-উ'। রূপচাঁদ কৌতুক বোধ করছে। ক্রমে ডাক বাড়ল, রেলের শব্দ হারিয়ে গেল। রূপচাঁদ জানালায় মুণ্ডু গলিয়ে পিছনে ফিরে তাকাল। কালস্রোত পশ্চাৎমুখী হল। কল্পনায় দেখল, কৈলাশ অপেরার মালিক ছোড়দা হন্যে হয়ে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।।]" [১১]

নাট্যদৃশ্যে রেলগাড়ির কামরা মনোজ হাজির তাঁর 'তেঁতুলগাছ' নাটকেও। একই মঞ্চকে কীভাবে ফার্ণিচারের দোকানঘর থেকে রেলগাড়ির কামরায় বদলে নেওয়া যায় মনোজ তা দেখিয়েছেন এখানে। দৃশ্যবিভাজনহীন এই একাঙ্কের শুরুতেই তাঁর নির্দেশনা -

"[এই কাঠের ফার্ণিচারের দোকানে মালপত্র বিশেষ কিছু নেই। দু'টো লম্বা-চওড়া থাক বিশিষ্ট মস্ত একটা র‍্যাক মাঝখানের অনেকটা জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। দেখতে অনেকটা রেলগাড়ির টু-টায়ার বার্থের মতো। র‍্যাকের গা লাগোয়া একধারে একটা চেয়ার, আরেক ধারে ছোট টেবিল। তিনটি বস্তু, সাজানোর গুণে, মিলেমিশে একাকার। নাটকের ভিন্ন ভিন্ন সময় ও ক্ষেত্রে, ভিন্ন ভিন্ন চেহারায় ধরা দেবে এই মূর্তিটি।]"[১২]

নাটকে দেখি যেটা সন্ধেবেলায় ছিল দোকানঘর, সেটি মাঝরাত্তিরে হয়ে গেল রেলের কামরা। এই পরিবর্তন ঘটাতে নাট্যকার খরচ করলেন কয়েকটি বাক্য। তেঁতুলগাছ কাটতে যাবার আনন্দে কুড়ল ঘোরাচ্ছিল ক্ষীরোদ। তারপর-

"[কুড়ুলের পাকের সংগে ট্রেনের হুইসিল বেজে ওঠে। চলমান রেলগাড়ির শব্দ এবং আলোছায়ায় দ্রুতলয় নাচন একযোগে শুরু হয়। কোন্ ফাঁকে যে ক্ষীরোদ ও ভবতোষ দু'তলা র‍্যাকের নিচতলায় জায়গা করে নিয়েছে, বোঝা যায় না। ক্ষীরোদ বসে আছে, ভবতোষ শুয়ে! ধরা যাক, এটা রেলগাড়ির কামরা।]"[১৩]

পালিয়ে বেড়ায় নাটকের রেলগাড়ির দৃশ্যের চেয়ে এই নাটকের দৃশ্য অনেক বেশি বিশ্বাস্য হয়ে উঠেছে সন্দেহ নেই। নাট্যকারের নির্দেশনায় রেলগাড়িতেই শেষ হয় না ক্ষীরোদ ভবতোষের যাত্রা। মঞ্চ একই থাকে, শুধু চরিত্রদের অবস্থান ও অঙ্গভঙ্গিতে ঐ মঞ্চই হয়ে যায় বাসের ছাত। বদল ঘটাতে নাট্যকার লেখেন-

"[ভবতোষ পেছন থেকে ক্ষীরোদের কোমর জড়িয়ে ধরে। ভীষণ শব্দে ট্রেন ছুটে চলেছে। আলোছায়া ছুটোছুটি করছে দু'জনের দেহের ওপর। ট্রেনের শব্দ ও আলো নাচন বন্ধ হতে মঞ্চ স্বাবাবিক চেহারায় ফিরে এল। দেখা গেল ক্ষীরোদ ও ভবতোষ র‍্যাকের ওপরের তাকে উবু হয়ে রয়েছে। আল্ল অল্ল দুলছে। মোটরের হরন বাজছে। মনে করা যাক্ র‍্যাকের ওপরের তাকটা বাসের ছাত।]"[১৪]

মঞ্চনির্দেশনার সাহায্যে এইভাবে ভিন্ন ভিন্ন পরিবেশ পরিস্থিতি ফুটিয়ে তোলেন নাট্যকার 'তেঁতুলগাছ' নাটকে।

'দেবী সর্পমস্তা' মনোজ মিত্রের আর এক প্রসিদ্ধ রচনা। বনপাহাড়ী এক অঞ্চল নাট্যকাহিনির প্রেক্ষাপট। সেখানকার মানুষের বিশ্বাস-সংস্কার নাট্যঘটনার অন্যতম চালিকা শক্তি। ফলে এ নাটকে মঞ্চসজ্জা ও মঞ্চনির্দেশনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে অনিবার্যভাবে। শুরুতেই নাটককার মনোজ যেন হাতে তুলে নিয়েছেন দক্ষ চিত্রশিল্পীর বর্ণিল তুলি। তাতে ধরতে চেয়েছেন মঞ্চ ও আবহকে-

"[দূরে দূরে পাহাড়—নিবিড় অরণ্যে ঢাকা। শ্যাম সবুজে আঁকা। পাহাড়ের সানুদেশে টিলা ও একটি জলাশয় বা

কুণ্ড। জলকুণ্ড ঘিরে ন্যাড়া পাথুরে জমি। একটি মাত্র গাছ। প্রাচীন, পত্রহীন, কঙ্কাল। বনপাহাড়ী অঞ্চলে আজ লোকদেবী সর্পমস্তার উৎসব। জঙ্গল পাহাড়ের অধিবাসীদের ভীড়। কারও কারও হাতে পতাকা। ধামসা মাদল ঢোল শিঙ্গা বাজছে। ...]"[১৫]

এই নির্দেশনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় মনোজ মিত্র পরিবেশ-পরিস্থিতেকে রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ সমেত ধরে দিতে চান। দৃশ্যের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চসজ্জার পরিবর্তনেরও নির্দেশ দিয়ে রাখেন নাট্যকার-

"[জেগে উঠল সিংহগড়ের রাজার মন্দির সংলগ্ন চত্বর। সন্ধ্যালগ্নে মন্দিরের দেবীর আরতি হচ্ছে। মুক্তদ্বার পথে তারই আলোকচ্ছটা চত্বরে। যুবক নৃপতি লোকেন্দ্রপ্রতাপ তার সমবয়সী বয়স্য রঙ্গলাল ও মধ্যবয়সী সেনাপতি ধনঞ্জয়কে নিয়ে দেবীপূজা দেখছে। অন্তরালস্থিত দেবীমূর্তির দিকে অপলক। ...]"[১৬]

অধিকাংশ নাটকে দীর্ঘ মঞ্চনির্দেশনা পাওয়া গেলেও সবক্ষেত্রেই যে তিনি ঐ পথে হেঁটেছেন, তা নয়। কোন কোন নাটকে তা এসেছে সংক্ষিপ্ত রূপে। তাঁর সংক্ষিপ্ত মঞ্চ নির্দেশনার দৃষ্টান্ত আমরা পাই 'মঞ্চেচিত্রে' একাঙ্কটিতে। মাত্র দুটি চরিত্র নিয়ে গড়ে ওঠা এই নাটকের শুরুতে সেই অর্থে কোন মঞ্চ নির্দেশনা রাখেননি। তবে রবীন্দ্রনাথের দু'ই পাখি কবিতার আদলে চারটির পংক্তির সংযোজন করেছেন-

"[মঞ্চাভিনেতা মঞ্চে থাকেন, আর চিত্রাভিনেতা চিত্রে বিধির বিধানে কিম্বা কে জানে মিলন হইল দুই মিত্রে।]"[১৭]

নাটকের এটিই সবচেয়ে বড় নির্দেশনা। এরপর খুব ছোট ছোট কিছু বাক্যাংশ ব্যবহার করেছেন। যেমন: 'স্বগত', 'প্রকাশ্যে', 'মরমে মরে গিয়ে', 'ক্ষেপে', 'পাল্টা হাসি ছাড়ে'--এই রকম।

'মদনের পঞ্চকাণ্ড' নাটক শুরু হবার আগে নাট্যকার একটি নাতিদীর্ঘ নির্দেশনা রেখেছেন। কেউ এসে মদনের একটা পরিচয় তুলে ধরবে সবার সামনে, যাতে মদনকে চিনতে সুবিধা হয়-- এমন নির্দেশ দিয়েছেন শুরুতে। চাকর মদনের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কথা সেখানে প্রকাশিত হবে। এই নির্দেশনার পর নাটকের রাশ সম্পূর্ণই তুলে দিয়েছেন নাট্যকার মদনের হাতে। শুধুমাত্র 'গান'-এই শব্দ ছাড়া আর কোন নির্দেশনা দেবার প্রয়োজন বোধ করেননি।

নাটক রচনার পাশাপাশি মনোজ মিত্র আমৃত্যু নাট্যনির্দেশনায় ব্যাপৃত রেখেছিলেন নিজেকে। ১৯৭৫ সাল থেকে সুন্দরম প্রযোজিত যাবতীয় নাটকের নির্দেশক ছিলেন তিনি। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় তিনি বুঝেছিলেন মঞ্চসজ্জা ও মঞ্চনির্দেশনার গুরুত্ব, তার শক্তি ও অসম্পূর্ণতা। প্রয়োগিক সেই অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা তাঁর নাটক রচনার সময় সচেতনভাবে কাজ করেছে। অন্যদিকে বিচিত্র স্বভাবের অসংখ্য মানুষের ভিড় তাঁর রচনায়। কোনো ভাব বা আদর্শের পিণ্ড হিসাবে নয়, রক্ত মাংসের গোটা মানুষ হিসাবে তাদের তুলে ধরতে চেয়েছেন নাটকে। শুধু মানুষ নয়, অসংখ্য মনুষ্যেতর প্রাণি এসেছে নাটকে। প্রেত, রাক্ষসও তার নাটকের চরিত্র। এমন কি দেব-দেবীদেরও দেখা মেলে তাঁর নাটকে। বিচিত্র বিষয়ভাবনা এবং বিচিত্র রকমের চরিত্রকে নিজের মনোমত করে হাজির করতে চেয়েছেন তিনি। তার জন্যই এত বিস্তৃত বর্ণনায় তাঁর পক্ষপাত।

Reference:

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রঙ্গমঞ্চ, বিচিত্র প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, পৌষ ১৪১৫, পৃ. ৬৮০

২। দে, ড. অপূর্ব, মনোজ মিত্রের সাক্ষাৎকার, নাট্যব্যক্তিত্বের মুখোমুখি, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, জুন ২০১২

৩। মিত্র, মনোজ, চাকভাঙা মধু, নাটক সমগ্র ১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, মাঘ ১৪০০, পৃ. ৫

৪। ভট্টাচার্য, ড. সাধন কুমার , নাট্য প্রযোজনা ও পরিচালনা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭, আগষ্ট ২০০৩, পৃ. ২৩

৫। মিত্র, মনোজ, নাকছাবিটা, নাটক সমগ্র ৪, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কার্তিক ১৪১০, পৃ. ৭

৬। মিত্র, মনোজ, শিবের অসাধ্যি, নাটক সমগ্র ২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, অগ্রহায়ণ ১৪০১, পৃ. ২৬৫

৭। তদেব

৮। মুখোপাধ্যায়, অর্ধেন্দু নাট্য সংলাপঃ মঞ্চ ও পরিপ্রেক্ষিত, বুকস ওয়ে, কলকাতা, ২০০৯, পৃ.৬১

৯। মিত্র, মনোজ, পরবাস, নাটক সমগ্র ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৩

১০। মিত্র, মনোজ, সাজানো বাগান, নাটক সমগ্র ২, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫

১১। মিত্র, মনোজ, পালিয়ে বেড়ায়, নাটক সমগ্র ৪, পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৯

১২। মিত্র, মনোজ, তেঁতুলগাছ, নাটক সমগ্র ৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিসার্শ, মাঘ ১৪০২, পৃ. ৪৪১

১৩। মিত্র, মনোজ,, তেঁতুলগাছ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৫

১৪। মিত্র, মনোজ, তেঁতুলগাছ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪৮

১৫। মিত্র, মনোজ, দেবী সর্পমস্তা, নাটক সমগ্র ৩, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৩৯

১৬। মিত্র, মনোজ, দেবী সর্পমস্তা, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৪০

১৭। মিত্র, মনোজ, মঞ্চেচিত্রে, নাটক সমগ্র ৫, মিত্র ও ঘোষ পাবলিসার্শ, মাঘ ১৪১৩, পৃ. ৩০৭

Bibliography:

আকর গ্রন্থ

১. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র ১, মিত্র ও ঘোষ পাবলিসার্শ, মাঘ ১৪০০.

২. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র ২, মিত্র ও ঘোষ পাবলিসার্শ, অগ্রহায়ণ ১৪০১.

৩. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র ৩, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, মাঘ ১৪০২.

৪. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র ৪, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, কার্তিক ১৪১০.

৫. মিত্র, মনোজ, নাটক সমগ্র ৫, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, মাঘ ১৪১৩.

সহায়ক গ্রন্থ

১. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ, রঙ্গমঞ্চ, বিচিত্র প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী তৃতীয় খণ্ড, বিশ্বভারতী, পৌষ ১৪১৫.

২.দাস, পুলিন, নাট্যনিরীক্ষণ: মঞ্চদর্পনে, এম সি সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০০২

৩. দে, ড. অপূর্ব, সাক্ষাৎকার মনোজ মিত্র, নাট্যব্যক্তিত্বের মুখোমুখি, দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা, জুন ২০১২.

৪. ভট্টাচার্য, ড. সাধন কুমার , নাট্য প্রযোজনা ও পরিচালনা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, আগষ্ট ২০০৩.

৫. ভট্টাচার্য, ড. সাধন কুমার, নাটকের রূপ রীতি ও প্রয়োগ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ, নভেম্বর ২০০২.

৬. মুখোপাধ্যায়, অর্ধেন্দু, নাট্য সংলাপঃ মঞ্চ ও পরিপ্রেক্ষিত, বুকস ওয়ে, কলকাতা, ২০০৯.

.

৭. সমাদ্দার, ড. শেখর, বাংলা নাট্য সংস্কৃতির ইতিহাস, প্রয়োগ প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০১০.
৮. সরকার, পবিত্র, নাট্যমঞ্চ নাট্যরূপ, অখন্ড সংস্করণ, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০৭৩, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০৮.

লেখক পরিচিতি :

ড. রফিকুল ইসলাম, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, মুর্শিদাবাদ মহারাজা কৃষ্ণনাথ বিশ্ববিদ্যালয়, বহরমপুর।
Dr. Rafikul Islam, Associate Professor, Department of Bengali, Murshidabad Maharaja Krishnanath University, Berhompore.
Mail id -rafikulislamknc17@gmail.com
Ph no –**8172070018**

CC BY NC